ফ্রেমের বাইরে

সোমশঙ্কর

মোদ্দা কথা হল মানুষের কাছে কিছু বার্তা পৌঁছে দেওয়া, তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা। সেটা নতুন বিরিয়ানির দোকানের উদ্বোধন হতে পারে, নতুন সিনেমার রিলিজ হবে তার খবর হতে পারে, চৈত্র সেলের আগাম খবর হতে পারে, ভোটের বার্তা হতে পারে আবার রাষ্ট্রের অপছন্দের কাজকর্মের বিরোধিতায় নাগরিকদের একজোট হওয়ার আহ্বানও হতে পারে। এই বার্তা বা কথা ক'টি চোঙা ফুঁকেও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, দেওয়া হয়ও। এখন আবার লোকাল টিভি বা সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রেও এ কাজটা করা হয়। রাস্তার ধারের হোর্ডিংও এই কাজে ব্যবহার হয়। এসবই আধুনিক উপায়। এছাড়াও আরও এক মাধ্যম আছে, অনেকদিন ধরে — আদি অকৃত্রিম পোস্টার।

পোস্টারের এক লম্বা ইতিহাস। সেখানে না ঢুকেও দু'একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। পরে প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণভাবে পোস্টারের শরীর বলতে বুঝি কাগজ। যার উপর পোস্টার ছাপা হয়। হাতে লেখা আঁকা পোস্টারও হয়। একসময় এর খুব চল ছিল। তার আবেদন অন্য স্তরের, সে প্রসঙ্গে আমি ঢুকছি না। আমি মূলত ছাপা পোস্টারের কথাই বলব। কাগজ তৈরির কৌশল মানুষ শিখে ফেলে ১০৫ সাল নাগাদ। কিন্তু বড় ঘটনাটা ঘটল, যখন গুটেনবার্গ (Gutenberg) হাতে চালানো প্রেস বানিয়ে ফেললেন। ১৪৪০ সালের ঘটনা। জ্ঞান ও তথ্য, যা এতদিন সমাজের একেবারে উঁচুতলার মানুষের একচেটিয়া অধিকার ছিল, তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে এল। চার্চের কর্তৃত্ব প্রশ্নের মুখে পড়ল। শোনা যায়, প্রোটেস্ট্যান্টরা (Protestant) যখন সাবেক খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে রিফর্ম আন্দোলন শুরু করেন, তখন সস্তার কাগজে ছাপা ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিল প্রচারের উদ্দেশ্যে বিলি করা হত, হাটে বাজারে। যেমনটা এখনও হয়ে থাকে। কোনোটায় আবার উডকাটের ছবিও থাকত। এ হল ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের ঘটনা। বিশ শতকের শুরুর দিকে জার্মান শিল্পীরা ছোট ছোট উডকাটের ছবি সস্তার কাগজে ছেপে হ্যাণ্ডবিলের মতো করে বিলি করতেন। ইয়োরোপে তখন সংকট ঘনিয়ে উঠছে।

ইয়োরোপে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই সিঙ্গলশীট পোস্টারের ব্যবহার চোখে পড়ে। উডকাটের ছবি হ্যাণ্ডপ্রেসে ছাপা। কমার্শিয়াল। ক্রমশ ছাপাযন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পোস্টারের চেহারা পাল্টাতে থাকে। ফ্রান্স জার্মানি ইংল্যাণ্ড সব জায়গায়। উনিশ শতকের শেষ দিকে, বিশ শতকের প্রথম দিকে, লিথোয় ছাপা পোস্টার, তথাকথিত ফাইন আর্ট আর কমার্শিয়াল আর্টের ফারাকটা ঘুলিয়ে দেয়। পার্থক্য বলতে, অল্প সংখ্যক অভিজাত ক্রেতা পৃষ্ঠপোষকরা সেলনে নির্বাচিত শিল্পীদের কাজ দেখতে যেতেন আর মূল্যাঁ রুজ (Moulin Rouge)-এর বাইরের বোর্ডে লাগানো টুলুজ লোত্রেকের (Toulouse

Lautrec) পোস্টার মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে যেতেন প্যারিসের পথচলতি মানুষজন। সময়ের কলে পড়ে, সেই সময়ে সেলনের নির্বাচিত অনেক শিল্পীই আজ বিস্মৃত। লোত্রেকের পোস্টার এখনও মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখে।

কোনও সন্দেহ নেই, বেশি সংখ্যায় মানুষের নাগাল পেতে পোস্টারের উপযোগিতা অনেক বেশি। অন্তত হ্যাণ্ডবিলের তুলনায়। হ্যাণ্ডবিল হাতে হাতে বিলি করতে হয়। তুলনায় কম সংখ্যার মানুষের কাছে পৌঁছোয়। দেওয়ালে সাঁটানো পোস্টার এক দানে অনেক মানুষ দেখতে পান, অনেক দিন ধরে। হ্যাণ্ডবিলের অবশ্য অন্য এক সুবিধা আছে। বিষয়টা কিছুটা ছড়িয়ে লেখা যায়। মানুষ হাতে নিয়ে পড়েন, দরকার মনে হলে রেখে দেন না হলে ফেলে দেন। যাঁরা হ্যাণ্ডবিল বিলি করেন, তাঁরা সবাইকে যে দেন তা তো নয়, বিষয় অনুযায়ী আন্দাজ করে মানুষের হাতে ধরিয়ে দেন। পোস্টারের এসব বাছবিচার নেই। দেওয়ালে সাঁটা রইল, যার দরকার দেখে নাও। মাধ্যম হিসেবে উদার ডেমোক্রেটিক। ফলে পোস্টারের ব্যাপ্তি বিশাল। সাধারণের মধ্যে ছবি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করার ক্ষেত্রেও পোস্টারের মস্ত ভূমিকা। সমাজবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন স্থান কালের নিরিখে এইসব তৈরি ধারণা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে শুরু থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়ে এসেছে, বিদেশে দেশে সবখানে। পার্থক্য একটাই। বিদেশে যত্ন করে সংরক্ষণ করা হয়েছে আর এদেশে অবহেলায় নষ্ট হয়েছে। এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।

এবার পোস্টার তৈরি করা নিয়ে আমার দুটো অভিজ্ঞতার কথা বলি। সম্পাদককে ধন্যবাদ, নিজের ঢাক নিজে পেটানোর সুযোগ করে দেবার জন্য।

প্রথম পোস্টারটা এপিডিআর-এর রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনে করা। হলুদ আর কালো রঙে অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা, ২০২১ সালে করা। ১৮ ইঞ্চি বাই ২৩ ইঞ্চি সাইজের সাদা রঙের পাতলা পোস্টার পেপারে ছাপা। খুবই সাদামাটা পোস্টার। শর্ত ছিল বেশি খরচ করা যাবে না, শহরের নোংরা চিত্র-বিচিত্র দেওয়ালে যেন চোখে পড়ে আর ডিজাইনটা এমন হতে হবে যেন সাধারণ মানুষের কাছে বার্তাটা সহজে পৌঁছোয়। শেষের শর্তটাই চ্যালেঞ্জিং। এই ধরনের পোস্টারের কিছু চালু ফর্মা আছে। বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে, হয়ে চলেছে। মানুষ একবার দেখেই বুঝে যায়। তাকে কিছুক্ষণের জন্যও দাঁড় করাতে পারে না। ফলে পোস্টারের টেক্সটাও সে অল্প সময়ের জন্যই দেখে। সহজেই ভুলে যাওয়া যায়। সুতরাং ডিজাইনটা এমনভাবে করতে হল, যাতে প্রথম দর্শনে দর্শকের মনে প্রশ্ন তৈরি হয়। সে একটু সময়ের জন্য হলেও দাঁড়িয়ে পড়ে। এটা কী? এর পরে পোস্টারের টেক্সটের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সে সহজেই ধরে ফেলে এর আবেদন। পড়ে নেয় পোস্টারের জরুরি কথাগুলো। এটুকু করতে পারলেই ডিজাইন সফল, যদি না হয় তো ব্যর্থ। অনেক সময় ডিজাইনের জন্য পোস্টার অনেকদিন মনে থেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার কথাবার্তাও। এখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসছে। যদি অনেক রং ব্যবহার করে পোস্টার বানানো যায় তবে কি বিবর্ণ দেওয়ালের প্রেক্ষিতে তা বেশি আকর্ষণীয় হবে না? উত্তর, হতেও পারে, নাও পারে।

তবে তা তৈরির খরচ যে কয়েকশো গুণ বেশি হবে তা হলফ করে বলে দেওয়া যায়। ঠিক এই কারণেই কমার্শিয়াল কোম্পানিগুলো পণ্য প্রচারের প্রয়োজনে এক ফন্দি বার করেছে। নজর করে দেখলে দেখতে পাবেন, অলিতে গলিতে হাটে বাজারে বিবর্ণ একরঙা লিথোয় ছাপা পোস্টার ছেয়ে থাকে। এর কী প্রয়োজন? মানুষ ভাল করে দেখেও না। যদি খেয়াল করেন, দেখবেন ওই একরঙা লিথো পোস্টারের বিষয়ভিত্তিক বহুরঙা দামি বড় আকারের পোস্টার কিংবা হোর্ডিং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল জায়গায় লাগানো রয়েছে। একরঙা সস্তার পোস্টারের কাজ হল, হোর্ডিং বা দামি পোস্টারের বিষয়টা মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া। এগুলি বিষয়টার বা প্রোডাক্টের সামগ্রিক প্রমোশনাল প্যাকেজের অংশ। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কোটি কোটি টাকার একটা অংশ এতে খরচ হয়।

মনোযোগ টানার অসম প্রতিযোগিতায়, বহুজাতিক দুনিয়ার সত্যিকারের বিরোধী সংগঠনগুলিকে কী ধরণের অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয় তা একবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে হল। শুধু তো এপিডিআর নয়, এ রকম বেশ কিছু সংগঠন আছে, মানুষ আছেন, যাঁরা চেষ্টা করে চলেছেন স্রোতের বিপরীতে গিয়ে এই বিপুল আত্মসংহারকারী মানবগোষ্ঠীকে ধীরে ধীরে লোভ ভোগের রাস্তা থেকে সরিয়ে এনে সুস্থ জীবনের সাথী করতে।

এবার সম্পূর্ণ অন্য একটা দিকের উল্লেখ করব। এই অভিজ্ঞতা একজন এ্যাক্টিভিস্টের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব। পোস্টার ছেপে আসার পরে, তা সংগঠনের বিভিন্ন শাখায় বিলি করে দেওয়া হয়। এবার আঠার পাত্র, ব্রাশ, পুরনো কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি নিয়ে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটিয়ে বেড়ানো। প্রধানত রাতের বেলা। বিড়ির বাণ্ডিল মাস্ট। নিজের ডিজাইন করা পোস্টার এখন সংগঠনের সম্পত্তি। সবার সঙ্গে হাত লাগিয়ে আমি নিজেও পোস্টার সাঁটাচ্ছি। কাজটা মোটেও সহজ না। কিন্তু ভেতরটা একটু যেন শান্তি পায়। শুধু আমার নয়, দলের সবার। যাঁরা সেদিন আসতে পারেননি, তাঁরাও ফোন করে কাজের খবর নেন। ভাবটা এমন, যাক কিছু একটা তো করা গেল!

এবার দ্বিতীয় পোস্টার, অন্য অভিজ্ঞতা। এপিডিআর-এরই চাহিদা। সংগ্রামপুর ইটভাটা শ্রমিক সমন্বয়ের কমিটির প্রয়োজনে। ইটভাটার মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হবে। পোস্টারটা ২০২৩ সালের মার্চ মাসে করা। পোস্টারের সাইজ ১৮ ইঞ্চি বাই ২৩ ইঞ্চি। লাল আর কালো রঙে করা। শৈলী, আমার অমার্জিত অভিব্যক্তিবাদী চিত্রভাষা। মনে হয়েছিল ইটভাটার মহিলা শ্রমিকদের অবর্ণনীয় কষ্টের ছবির জন্য এই ভাষাই যথাযথ। গোল বাধল অন্যখানে এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। যারা ধর্ম ও শ্রেণিগত ভেদাভেদ মানেন না, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন, তাঁদের একটা ছোট্ট অংশ পোস্টারটা নিয়ে আপত্তি জানালেন।

পোস্টারটিতে নারী শ্রমিককে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে দেবত্ব আরোপ করেছিলাম। আধুনিক সভ্যতার প্রতীক আকাশছোঁয়া ইমারত সৌধের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছোট ছোট অংশগুলো যারা ঘাম রক্ত এবং কখনও কখনও ইজ্জতের বিনিময়ে তৈরি করে চলেছেন, তাঁরা তো এটুকু সম্মান আশা করতেই পারেন।

অভিযোগটা ছিল ডিজাইনে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার নিয়ে। এপিডিআর-এর মতো সংগঠনে এটা

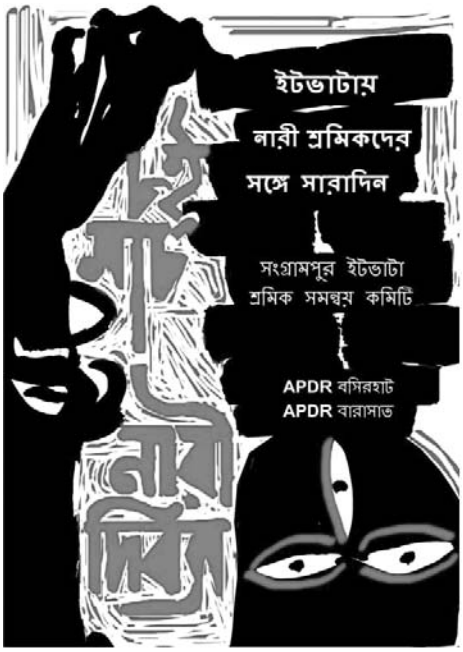

বেমানান, গর্হিত। যাঁরা অভিযোগটা এনেছিলেন, তাঁদের কালো রঙে আঁকা মানবীর ইমেজ হিন্দুদের আরাধ্যা দেবী কালীর কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। তার ওপর আবার ত্রিনয়ন। ওই দেবীমূর্তি তাঁদের অনেক দিনের চেনা। উদোম রোদ আর ইটভাটার গনগনে আগুনে ঝলসে কালো হয়ে যাওয়া অনার্য দেবীর মূল উপাসকদের চেহারা তুলনায় অপরিচিত, মেলানো কঠিন। যাঁরা সমালোচনা করলেন তাঁরা ভেবে দেখলেন না, এখানে ধর্মকে মহিমান্বিত করা হয়নি। বরং ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার করে কর্মঠ নারী শ্রমিকদেরকেই সম্মান জানানো হয়েছে। তার সঙ্গে ডিজাইনে একটা দেশি চেহারা দেওয়াও সম্ভব হয়েছে।

পরে মনে হয়েছিল, এই বিতর্ক এড়ানো যেত। একই বিষয়ে একই ভাব নিয়ে আরও কয়েকটা খসড়া দেখে নেওয়া যেত। আরও কিছুটা বাড়তি সময় যদি দিতাম। ডিজাইনারের প্রাথমিক শর্ত পালন করিনি, তাই এই বিপত্তি। বলে রাখি, পোস্টারটা কাগজে ছাপা হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল।

এই দেশে পুরনো দিনের পোস্টারের কোনও সংরক্ষণ হয়নি, ডকুমেন্টেশন হয়নি, এই কারণে লেখার এক জায়গায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম। এই লেখার শেষে এসে কিছুটা হলেও ভাল লাগছে এই ভেবে যে কাজটা শুরু হয়েছে। এর আগে এই কাজ এভাবে হয়েছে কিনা জানা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে বিশ শতকের কাঠখোদাই লিথোয় ছাপা বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। তার কোনও ক্রমিক ইতিহাস নেই। চল্লিশের রাজনৈতিক আন্দোলনে হাতে আঁকা পোস্টারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সব হারিয়ে গেছে। ইদানিং পোস্টার নিয়ে আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। দুই বাংলাতেই। এর মধ্য দিয়ে সচেতনভাবে ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা শুরু হয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, বিশেষ করে এই অসময়ে। আরও কেউ কেউ থাকতে পারেন, আমি কিন্তু একজন মানুষকেই দেখেছি, শুভেন্দু দাশগুপ্ত। খর্বাকৃতি গাভাস্কারের মতোই ইনিংস শুরু করছেন, জেতার চান্স প্রায় নেই জেনেও। এখন ধীরে ধীরে অনেক হাত তার চারপাশে জড়ো হচ্ছে। আশা জাগছে। আগামী প্রজন্ম কাজ করার মতো মালমশলা পেয়ে যাবে হয়ত।

সোমশঙ্কর : চিত্রকর এবং ভবানীপুর ডিজাইন একাডেমির অধ্যক্ষ।